দেশ বিভাগ এবং বাংলায় উদ্বাস্তু সমস্যা

মিঠুন দাস
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া
e-mail : dasmp2016@gmail.com

১৯৪০ সালের মুসলিম লীগের প্রস্তাবে 'পাকিস্থান' কথাটির উল্লেখ না থাকলেও মুসলিম প্রধান অঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের কথা স্পষ্ট বলা হয়েছিল। এদিকে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্থান সৃষ্টির দাবিতে অনড় ছিলেন। অন্যদিকে হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসাবে সাভারকর হিন্দুত্ববাদকে ভারতবর্ষে আরও শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। তিনি কংগ্রেসের মুসলিম তোষন নীতির তীব্র সমালোচনার পাশাপাশি মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচক মন্ডলী ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বে আপত্তি জানান। ১৯৩৭ সালে হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসাবে তার ভাষনে তিনি বলেছিলেন 'ভারতবর্ষকে আর ঐক্যবদ্ধ ও সমজাতীয় রাষ্ট্র বলা যায় না। এখানে হিন্দু মুসলিম পরস্পর দুটি বিরোধী জাতি বাস করছে।' অর্থাৎ একদিকে জিন্না ও অন্যদিকে সাভারকার দুই নেতাই দ্বি জাতি তত্ত্বের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। দেশভাগের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগ হিন্দু মহাসভার উগ্র জাতিগত চিন্তা ইন্ধন যুগিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার ঠিক করে যে ধীরে ধীরে তারা উপনিবেশগুলি থেকে সরে আসবে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য মাউন্টব্যাটেনের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু জিন্না ও মুসলিম লীগের চাপ, ১৯৪৬ সালে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে দেশের পূর্ব অংশে দাঙ্গা বিশেষত নোয়াখালি, বিহার, কলকাতায় যা দেশভাগের পথ কে আরও প্রশস্থ করে।

এই সময় আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে বলে গোয়েন্দা রিপোর্ট ব্রিটিশদের কাছে ছিল। কলকাতায় দাঙ্গা ব্রিটিশদের উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছিল। অনেক অতি সাম্প্রদায়িক মুসলমান আজও সগর্বে বলে থাকেন যে, কলকাতা দাঙ্গাই পাকিস্থান এনেছিল। একথা নিতান্ত মিথ্যা নয় এই দাঙ্গার পরে ইংরেজ, হিন্দু, মুসলিম তিনপক্ষই বুঝতে পারেন দেশবিভাগ ছাড়া উপায়ন্তর নেই।[১] উল্লেখ্য যে কলকাতার থেকেও নোয়াখালি ও বিহারের দাঙ্গা ছিল উদ্বেগজনক।[২] এই পরিস্থিতিতে তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলী ভারতভাগের সিদ্ধান্তের কথা জানান হাউস অফ কমন্স-এ। ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখার সব প্রয়াসই যখন ব্যর্থ হল তখন ভারত বিভাগ ছাড়া কোন পথ ছিল না। উল্লেখ্য যে, অনেক আলাপ আলোচনা, রক্তপাতের পর যখন স্থির হল ভারতকে দ্বিখন্ডিত করে ভারত ও পাকিস্থান নামে দুটি ডমিনিয়নের সৃষ্টি করা এবং এই দুই ডমিনিয়নের কাছে ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। তখন বাংলা পাঞ্জাবকে দ্বিখন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে ভারত ভাগের সঙ্গে এই দুটি প্রদেশ ভাগের সিদ্ধান্তের তফাৎ ছিল। ভারতভাগ, পাকিস্থান সৃষ্টি, ক্ষমতা হস্তান্তর

এসবই ছিল একসূত্রে গাঁথা, এক প্যাকেজ এর অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু বাংলা বা পাঞ্জাব বিভাগ তা ছিল না, তাদের একাংশ পাকিস্থান ও অপরাংশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে কি না সে সিদ্ধান্তের ভার ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এই দুই প্রদেশের বিধানসভার সদস্যদের উপর।

১৯৪৬ সালে নির্বাচিত অবিভক্ত বাংলার শেষ বিধানসভাতেই স্থির করতে হয়েছিল বাংলা ভাগ হবে কি না, বাংলার একাংশ ভারতেরও অপরাংশ পাকিস্থানের অন্তর্ভূক্ত হবে কিনা।[৩] অবিভক্ত বাংলার বিধানসভায় মুসলিম লীগ বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল, কংগ্রেস দিয়েছিল পক্ষে, কমিউনিস্ট পার্টি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিল, তবে জ্যোতিবাবুর ভাষায় "আমাদের পার্টি বাধ্য হয় বঙ্গভঙ্গ বিভাগের বাস্তবতা মেনে নিতে।"[৪]

উদ্বাস্তু সমস্যা ও আন্দোলন

দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যাও ছিল খুবই জটিল। প্রথম সমস্যাই ছিল দেশ ভাগের পর শরণার্থী সমস্যা। ড় ঘোষের মুখ্যমন্ত্রীত্বের প্রথমদিকে এই সমস্যা খুব একটা বড় আকার ধারণ করেনি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বের সময় তা ব্যাপক আকার ধারণ করে। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু আগমন শুরু হয় ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ নোয়াখালি দাঙ্গার সময় থেকে। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ, ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারিতে পুনরায় দাঙ্গার ফলে আরও উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় নানাবিধ কারণ এর পিছনে ছিল। বৈষম্যমূলক ব্যবহার, প্রাণের ভয়, ইজ্জত্বের ভয় ইত্যাদির জন্য উদ্বাস্তুর শরণার্থীরা সব কিছু ফেলে চলে আসতে বাধ্য হয়। এই পরিস্থিতিতে প্রধান মন্ত্রী নেহেরু ঘোষণা করেন পূর্ববঙ্গে বিপন্ন মানুষদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।[৫] ১৯৪৭ সালের পরবর্তীপর্বে এক দশকের মধ্যে ৩০ লক্ষের ও বেশি মানুষ উদ্বাস্তু হিসাবে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই উদ্বাস্তু স্রোত সরকারী মহলে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এত মানুষ পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসায় জন বিস্ফোরণ ঘটে যায়, ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ থেকে পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের আগমন বন্যার মতো রূপ নেয়। জলপথে, রেলপথে, পায়ে হেঁটে ও অন্যান্য উপায়ে উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গে চলে আসতে থাকে। দাঙ্গা, হাঙ্গামা চলার ফলে বহু হিন্দু প্রাণ ভয়ে নিজেদের সম্পত্তি ফেলে রেখে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। শিয়ালদহ স্টেশনে প্রতিদিন কয়েক হাজার উদ্বাস্তু থাকত এবং তাদের সাহায্যের জন্য কাশী বিশ্বনাথ সমিতি, রামকৃষ্ণমিশন, শ্রীরাম কৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ও ভারত সেবাশ্রমের পাশাপাশি এই সময় স্বতস্ফূর্ত ভাবে অনেকগুলি উদ্বাস্তু কল্যান সমিতি গড়ে ওঠে। সরকারের আর্থিক সহায়তায় এই উদ্বাস্তু কল্যাণ সমিতি গুলি উদ্বাস্তুদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করত। জানা যায়, অল বেঙ্গল রিলিফ কমিটি এবং সেন্ট্রাল ক্যালকাটা রিলিফ অ্যান্ড পীস কমিটি সম্মিলিত ভাবে প্রায় দুইশত উদ্বাস্তুকে খিচুড়ি খাওয়াতো। ইন্ডিয়ান রেডক্রশ ও আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান শিশু ও অক্ষম ব্যক্তিদের দুধ সরবরাহ করত।[৬] শিয়ালদহ স্টেশন ছাড়াও বিভিন্ন স্টেশনে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু বিবাহযোগ্য কন্যা, রোগগ্রস্থ বৃদ্ধ, শিশু ইত্যাদি পরিবার পরিজন নিয়ে অত্যন্ত দুঃসহ অবস্থায় নিজেদের পরণের কাপড় দিয়ে পার্টিশন তৈরী করে, অত্যন্ত ঘেষাঘেষি করে বাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাদের জীবনে কলেরা, বসন্ত, হাম, যক্ষা, গুন্ডাদের আক্রমণ, মেয়ে পাচার কী না ঘটেছে। দেশভাগের ফলে এরা ছিন্নমূল বাস্তুহারায় পরিণত হয়েছিলেন, নতুন জগতের এই বাস্তুহারা অভিবাসীদের নাম হয়েছিল রিফিউজি।[৭]

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে সবচাইতে বড় জ্বলন্ত সমস্যা ছিল উদ্বাস্তু সমস্যা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে যা এক চ্যালেঞ্জ হিসাবে উঠে এসেছিল। ১৯৫০ সালের পূর্বে দাঙ্গা, ১৯৫২ সালে ভারত পাকিস্থানের মধ্যে পাস পোর্ট প্রথা চালু হলে সংখ্যালঘু হিন্দুরা জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার জন্য দলে দলে বৃহৎ সংখ্যায় চলে আসতে থাকে। ১৯৫০ সালে নেহেরু লিয়াকৎ চুক্তি সংখ্যালঘু হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ না হয়ে বেড়ে যায়। স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯৪৬ সালে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৮ হাজার ৬০২ জন। ১৯৫০ সালে সেই সংখ্যা ছিল ১১লক্ষ ৭২ হাজার ৯২৮ জন।[৮] ১৯৫০ খ্রীঃ গোড়ায় বঙ্গেই দাঙ্গা, হাঙ্গামা, খুন জখমের হার অনেকখানি কমে যাওয়ায় উদ্বাস্তুদের আগমনও কমে আসে। কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাসের শেষে সর্বাত্মক দাঙ্গা হাঙ্গামার বিস্তৃতির ফলে পুনরায় সংখ্যালঘু হিন্দুরা রীতিমত বিচলিত হয়ে ওঠেন। এপ্রিল মাসে দেশের উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে নেহেরু-লিয়াক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ভারত উপমহাদেশের পূর্ব অঞ্চলে এই দুই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যাপক হারে যে বাস্তুত্যাগ শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কে কি নীতি গ্রহণ করা হবে তাই ছিল চুক্তির বিষয়। ঠিক হয় উদ্বাস্তুদের যে যার নিজেদের রাষ্ট্রে ফিরে যেতে উৎসাহিত করা হবে এবং ফিরে গেলে যাতে পরিত্যক্ত সম্পত্তির দখল পায় তার ব্যবস্থা করা হবে।[৯] নেহেরু লিয়াকৎ চুক্তির ফলে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যা আরও ব্যাপক হয়। এখানে উদ্বাস্তুরা যে সম্পত্তি পরিত্যাগ করেছিল তা পুনবার্সনের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি। পশ্চিমবাংলা ঘন জনবসতি পূর্ন হওয়ায় উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ আরও জটিল হয়ে পড়ে। পুনর্বাসনের জন্য জমি সংগ্রহ করতে হলে যারা পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব হতে বাস করছে তাদেরই ভূমি সংগ্রহ করতে হত। এর ফলে উদ্বাস্তু পরিবারের সাথে পশ্চিমবঙ্গ বাসীর একটা মনোমালিন্য বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা গেল। তাই পরিণতিতে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এক অবস্থায় প্রবলভাবে বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল।[১০]

পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা নিরাপত্তা বিধান এবং ভারতে আগমন নিবারণ করার জন্য 'পূর্ব পাকিস্থান সংখ্যালঘু বাঁচাও কমিটি' গঠিত হয়। এই কমিটি ১৯৫০ সালে স্বাক্ষরিত জওহরলাল নেহেরু - লিয়াকৎ চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করে একপত্রে জানায় যে, এই চুক্তি বৈষম্যমূলক ও সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে হিন্দুদের আশংকা আরো তীব্র হবে।[১১] অশোক মিত্র, উদ্বাস্তুদের চরম দুর্দশার কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন - "কলোনিতে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে শহরের বস্তিতে জড়ো হওয়া শরণার্থী সম্প্রদায় দুই দশকে মস্ত ক্রান্তির মধ্য দিয়ে গেছেন। বামুন - বদ্যি-কায়েতরা পূর্ববঙ্গের ভিটেমাটির নিটোল সুখ স্বাচ্ছ্যন্দ্যের স্বপ্ন গর্ব অহমিকা আস্তে আস্তে ভুলেছেন। গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ ইত্যাদির স্মৃতি ফিকে হতে হতে একেবারেই মিলিয়ে গেছে, বর্তমানের প্রকট দারিদ্র্য খিন্নতার মধ্যে যে ছেলে মেয়েরা অস্বাস্থ্যে বিরক্তিতে বড়ো হয়ে উঠেছে, পূর্ববঙ্গের অভিজাত রূপ কাহিনী তাদের কাছে উপহাস কথার পরিচয় নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। যেখানে স্মৃতি নেই, সেখানে জড়তা নেই, কলোনির শিশু সম্প্রদায় তাই সমতায় মিলতে পেরেছে, বিত্তহীনদের অভাবের সমতায় পরস্পরের কাছাকাছি চলে এসেছে।"[১২]

উদ্বাস্তুরা যেভাবে পশ্চিমবঙ্গে ছিন্নমূল শরনার্থী হয়ে চলে এসেছিল তা অত্যন্ত বেদনার। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি শ্রেণী এই মানুষদের কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করত। কাতারে কাতারে উদ্বাস্তু এদেশে চলে আসায় এখানকার স্থায়ী বাসিন্দারা চাকরি ও বাসস্থান বিষয়ে উদ্বেগে পড়ে যান। প্রথম দিকে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনে তেমনি সরকারী সাহায্য পাওয়া না গেলেও। এদের সাহায্য করার জন্য বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এগিয়ে এসেছিল। যেমন ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন, মারোয়ারি রিলিফ কমিটি, বিশ্বনাথ সেবা সমিতি, নারী

সংগঠন প্রভৃতি। বেসরকারী উদ্যোগে সাহায্যের ব্যবস্থা থাকলেও প্রয়োজনের তুলনায় যা ছিল খুবই ক্ষুদ্র। রিলিফের জন্য উদ্বাস্তুদের হাহাকার পড়ে গিয়েছিল। এক বাস্তুহীন মহিলা সংবাদপত্রে প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন আমরা বাধ্য হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে এসেছি। সরকারের কাছে আমাদের প্রার্থনা আমাদের জন্য কোন রিলিফের বা রেশন দানের ব্যবস্থা করা হয়।[১৩] বাংলার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বিষয়টি ভারত সরকার যথোচিত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে নি, বরং তাদের মনোভাবে এক অমার্জনীয় উদাসীন্য প্রকাশ পেয়েছিল। এমন অভিযোগ বিভিন্ন মহল থেকে উঠে আসছিল। সরোজ চক্রবর্তী দেখিয়েছেন মাসের পর মাস ভারত পূর্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তু সমস্যার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করতে চায় নি।

মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় বারবার সাহায্য চেয়েও বিফল হচ্ছিলেন ক্ষিপ্ত হয়ে এক সময় তিনি বলে ওঠেন মানুষের এই চরম দুর্ভোগের শেষ করতে হলে চাই এখন যুদ্ধ। উদ্বাস্তুদের দাবি নিয়ে এই সময় বিশেষভাবে সরব ছিলেন ড. মেঘনাদ সাহা, আচার্য যদুনাথ সরকার, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং ড. শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।[১৪]

উদ্বাস্তু আগমন পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে এক বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সাহায্যের অপ্রতুলতা পুনর্বাসন সমস্যাকে জটিল করে তুলেছিল। উপরন্তু উদ্বাস্তুরা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উপেক্ষা ও অবহেলার শিকার হয়েছিলেন। স্বাভাবিক বাঁচার তাগিদে উদ্বাস্তুদের মধ্যে থেকে উঠে আসে বিভিন্ন আন্দোলন। রাত জেগে শিবির পাহারা, জমির জবর দখল, সহিংস ও অহিংস আন্দোলন এর মধ্যে ছিল অন্যতম।[১৫] দেশভাগের জন্য কংগ্রেসের দায়িত্ব ও পরবর্তীকালে উদ্বাস্তুদের প্রতি কেন্দ্রীয় বঞ্চনা এক বিকল্প রাজনীতির সন্ধান দিয়েছিল। ১৯৪২ এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় কমিউনিস্টদের জনযুদ্ধের নীতি সাধারণভাবে তাদের অপ্রিয় করে তুলেছিল। কিন্তু এখন এক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে উদ্বাস্তু আন্দোলনের মধ্যে তারা তাদের ভিত খুঁজে পেয়েছিল।[১৬] উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৫০ সালের আগস্টে প্রধানত বামপন্থীদের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে ইউ. সি. আর. সির জন্ম হয়। (United Central Refugees Council)। সি. পি. আই. এর তাত্ত্বিক উদ্বাস্তু নেতা অনিল সিংহের প্রচেষ্টায় সব ধরণের উদ্বাস্তুদের একত্রিত করে একটি মাত্র উদ্বাস্তু সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা হিসাবেই ১৯৫০ সালে কলকাতার কমার্শিয়াল মিউজিয়াম হলে ৪৩টি উদ্বাস্তু সংগঠনের ২০০জন প্রতিনিধি একটি সম্মেলনে মিলিত হন। সেখানেই জন্ম হয় উদ্বাস্তু আন্দোলনের একমাত্র বৃহত্তর উদ্বাস্তু সংগঠন ইউ. সি. আর. সির.। এই উদ্বাস্তুরা পশ্চিম বাংলার মাটিতে পুনর্বাসনের প্রত্যাশায় কমিউনিস্ট পার্টির দিকে ঝুঁকতে শুরু করে।[১৭] Marcus Franda *'The Political Development and Political Decay in Bengal'* গ্রন্থে পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তুদের কালক্রমে বামপন্থী রাজনীতি ও আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়ার কথা বলেছেন।[১৮]

দেশভাগ কি ভাবে মানুষের জীবন যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তুলেছে সে কথা বলতে গিয়ে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছে, হিন্দুদের পূর্ববঙ্গ থেকে চলে আসার প্রধান কারণ হল দেশের শাসনব্যবস্থার পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের অভাব, সেনাবাহিনী ও পুলিশে হিন্দু অফিসারদের নগন্য সংখ্যা, জোর করে হিন্দুদের সম্পত্তি দখল, লুটপাট, বিনা বিচারে হিন্দুদের আটকে রাখা, বাড়ি বাড়ি তল্লাশি, অর্থনৈতিক সংকট।[১৯]

জয়ন্তী বসু তার *'Constructing in Bengal Partition'* গ্রন্থে পূর্ব বাংলার মানুষের বিত্তশালী জীবন, প্রকৃতি ভরা মনোরম পরিবেশ এর সাথে পশ্চিমবঙ্গে সেই সকল মানুষদের উদ্বাস্তু জীবন, রুক্ষ পরিবেশ, কষ্ট ও দৈন্য দশার উল্লেখ করেছেন। দেশভাগ এই উদ্বাস্তুদের জীবনে কি ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সে কথা তিনি

ব্যক্ত করেছেন।[২০] দেশভাগের পর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গণ-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নারী জাতিকে সংগঠিত করার উদ্যোগ নেয়। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসা মানুষজনদের পুনর্বাসনের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, অন্যান্য বামপন্থী গণসংগঠনের সাথে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি এগিয়ে আসে। ১৯৫৫ সালের ৮মে ২৪ পরগণার কৃষ্ণপুর বারোয়ারিতলায় পশ্চিমবঙ্গ ক্যাম্পে উদ্বাস্তু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভানেত্রী ছিলেন রেণু চক্রবর্তী। এই সম্মেলনে ক্যাম্প ব্যবস্থার উন্নতির দাবি জানানো হয়। দাবির মধ্যে ছিল উদ্বাস্তুদের ক্যাম্প কমিটি গঠনের অধিকার দেওয়া, ওয়ার্ক সাইট ক্যাম্প খোলা, পুনর্বাসন কেন্দ্রে পেশা অনুযায়ী কাজ, রবিবার ছুটি, ন্যায্য মজুরি, টিউবওয়েল খনন, সরকারী গাফিলতিতে বাতিল বায়নানামার ক্ষতিপূরণ দেওয়া, ধাপা, মানপুর, বাগ জোলার উদ্বাস্তুদের পুনবার্সন, কুপার্স ক্যাম্পকে পুনর্বাসন কেন্দ্রে পরিণত করা ও পুলিশি জুলুম বন্ধ করার দাবিও জানানো হয়।[২১] উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে উদ্বাস্তু কমিটির নেতৃত্বে পি. এস. পি, ফব ও লোক সেবক সঙ্ঘ আইন অমান্য করে রাজভবন অভিযান করে। এই আন্দোলনে লীলা রায় সহ ১১৯ জন গ্রেপ্তার হন।[২২]

দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্থান থেকে আগত উদ্বাস্তুরা প্রথম দিকে বিভিন্ন ক্যাম্পে থাকলেও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জেলায় ও কলকাতা মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্তে জবর দখল কলোনির সংখ্যা বাড়তে থাকে। বিভিন্ন এলাকায় জলাজমি, রেললাইনের কাছাকাছি পরিত্যক্ত ও পতিত জমি দখল করে উদ্বাস্তু কলোনি গুলি গড়ে ওঠে।

কলকাতায় জবর দখল কলোনিগুলি গড়ে ওঠে। কলকাতায় জবর দখল কলোনীগুলি গড়ে উঠেছিল টালীগঞ্জ, যাদবপুর, কসবা, দমদম, সন্তোষপুর, সোদপুর প্রভৃতি স্থানে। ১৯৫০ এর অক্টোবরে জবর দখল কলোনীগুলির একটি তালিকা তৈরী করা হয়। যাতে দেখা যায় কলকাতায় ১৩৩টি কলোনি গড়ে উঠেছিল তাতে ২১,৩৭৭টি পরিবার পুনর্বাসন পায়। কলোনিগুলি হল - কাটজু কলোনি, বিধান কলোনি, নেতাজী কলোনি নামে পরিচিত হয়।

কলকাতায় কলোনী গুলির মধ্যে বেলঘড়িয়ায় অবস্থিত শহীদ যতীন দাস কলোনী, যাদরপুরের নিকট অবস্থিত বিবেকানন্দ কলোনী, নেতাজী কলোনী ইত্যাদি ছিল বৃহদাকার।[২৩] তবে সকলের তো পুনবার্সন সম্ভব নয় অনেকেই সরকারী ক্যাম্পে দিন কাটাতে লাগলেন। ক্যাম্পগুলির দুর্গতির কথা উল্লেখ করেছেন মনিকুন্তলা সেন - 'ক্যাম্প যে মানুষেরর সম্মান বোধকে কত নীচে নামিয়ে দেয় সেসব আমি নিজের চোখে দেখছি, ক্যাম্পে ঘুরে ঘুরে।' তিনি তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "কোনো ক্যাম্পে গেলে সবাই আমাকে তাদের কি ধরণের বিশ্রী কাপড় দেওয়া হচ্ছে, কি রকম বিশ্রী চাল দেওয়া হচ্ছে এসব দেখাতেন। তাই নিয়ে সরকারের কাছে দরবারও করতাম। কিন্তু তাদেরকে বলতাম ভিক্ষের চাল কাপড়ের তো ভাল মন্দ নেই। আপনারা কাজ দেবার দাবী করুন এবং তার বিনিময়েই চাল কাপড় নেবেন। তখন ঐসব জিনিস খারাপ হলে যারা দিচ্ছে তাদের মুখের উপর ছুড়ে ফেলবেন। কিন্তু এ বোধটা জাগাতে পারতাম না। এরা তো এমন ছিল না। দেশ গাঁয়ে এরা যে যার মত কাজ করে খেত। ভিক্ষের অসম্মানে তো যেত না। দীর্ঘদিন ক্যাম্পে বাস করে এরা যে একটা পরনির্ভরশীল শ্রেণিতে পরিণত হলো এবং আত্মসম্মানবোধটা হারিয়ে ফেললো। সেটাই এক পীড়াদায়ক ঘটনা।।'[২৪]

তবে উদ্বাস্তুদের জীবনে পুরোটাই হতাশার চিত্র ছিল না। নতুন দেশে মানিয়ে নিতে, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের জোগাড় করতে নানান অসুবিধার সম্মুখীন যেমন হতে হয়েছিল। তেমনি জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার লড়াই এ

নূন্যতম সরকারী সাহায্যের পাশাপাশি বেসরকারী সাহায্য তাদের জন্য এগিয়ে এসেছিল। উদ্বাস্তু ছেলেও মেয়েদের জন্য পৃথক আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিলো। টিটাগড় ও আন্দুল রোডে শালিমারের নিকট ছেলেদের জন্য শিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে তাদের শিক্ষা, নীতি শিক্ষা, শরীরচর্চার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সরকারের তত্ত্বাবধানে বালিকাদের জন্য দুটি আশ্রয় শিবির খোলা হয়। একটি খোলা হয় রিজেন্ট পার্কে অশোক অ্যাভিনিউতে। সেখানে পাঠশিক্ষা ছাড়াও হাতের কাজ শেখানো হত। অপরটি স্থাপিত হয়েছিল উত্তর পাড়ায় সেখানে বয়স্কদের মেয়েদের হাতের কাজ যেমন কাপড় বোনা, সাবান উৎপাদন, দরজির কাজ ইত্যাদি নানা কুটির শিল্প শেখানোর ব্যবস্থা ছিল।

কলিকাতায় মহিলাদের তত্ত্বাবধানে অনেকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল সেখানে আশ্রয়বাসী মেয়েদের হাতের কাজ শেখানো হয়। যেমন আনন্দ আশ্রয়, নারী সেবা সংঘ, উদয় ভিনর ইন্ডাস্ট্রিয়াল হোম এবং অল বেঙ্গল উইমেন্স হোম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।[২৫] মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় উদ্বাস্তুদের পুনবার্সনের জন্য আন্দামানকে বেছে নেয়। এখানে প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষের একটি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। আন্দামানে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কারণ হল -

১) যেখানে নতুন উপনিবেশ স্থাপন হচ্ছে সেখানে মানুষের বাস প্রথম থেকেই আরম্ভ হচ্ছে। সুতরাং সেখানে যারা যাবে তারাই সমাজ গড়ে তুলবে। সে সমাজ নিজেদেরই সমাজ। এতে মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি যেমন পুনর্বাসনের অনুকূল হয় তেমনি নিজের হাতে গড়া নতুন সমাজের মধ্যে বাস করাও তার পক্ষে স্বদেশে বাস করার সমস্থানীয় হয়।

২) আন্দামানের যা পরিবেশ তা একাধিক দিক হতে পূর্ব বাংলার অনুরূপ, সমুদ্রের মাঝখানে অবস্থিত হওয়ায় এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। কাজেই আমন ধান উৎপাদন করা সহজ। চট্টগ্রামও সিলেট জেলার ন্যায় টিলা ও সমতল ভূমির সমাবেশ এখানে দেখা যায়। পূর্ববঙ্গ ও এখানকার প্রাকৃতিক সাদৃশ্য থাকায় এখানে উদ্বাস্তুদের মন বসে।

৩) এখানকার জমি উর্বর, দীর্ঘকাল অনাবাদী থাকার ফলে তার শস্য উৎপাদন শক্তি প্রচুর। সুতরাং ধানের ফলন ভালোই হয়। ফলে উদ্বাস্তু পরিবারগুলি এখানে শস্য উৎপাদন করে সমৃদ্ধ হয়েছে। আবার বেসরকারী রীতিতেও অনেকে আন্দামানে গিয়ে পুনর্বাসন নিয়েছে।[২৬]

আন্দামান ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্ধ্রপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও ওড়িশার সীমান্ত জুড়ে ৮০ হাজার বর্গমাইল এলাকায় দন্ডকারণ্যে উদ্বাস্তুদের প্রথমে ৩৫,০০০ পরিবার এর পুনর্বাসনের কথা ছিল। পরে তা কমিয়ে ৭,০০০ হাজার পরিবার করা হয়। কিন্তু দন্ডকারন্য যেতে অনেকেই অস্বীকার করে। ক্যাশডোল, রেশন প্রদান বন্ধ করা হলে এবং বলপূর্বক দন্ডকারন্যসহ অন্যান্য অঞ্চলে পুনবার্সনের জন্য পাঠানোর প্রতিবাদে ৫০ ও ৬০ এর দশকে উদ্বাস্তুরা আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের দাবি জানাতে থাকে।

ক্যাম্প ও কলোনীর মানুষেরা বাস্তুহারা পরিষদের নেতৃত্বে আন্দোলন গড়ে তোলার কারণে পুলিশী লাঠিচার্জ ও অত্যাচারের শিকার হন এবং শত শত নরনারী গ্রেপ্তার হন।[২৭] দন্ডকারন্য পরিকল্পনা নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে পার্লামেন্টে একে 'তুঘলকি পরিকল্পনা' বলে অভিহিত করেন সাধনগুপ্ত। ১৯৫০ এর দশক ছিল উদ্বাস্তু আন্দোলনের দশক। বলপূর্বক দন্ডকারণ্যে প্রেরণের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুরা কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে আন্দোলনে নামলে সরকার জোর করার নীতি প্রতাহার করে নেয়। তবে দেশভাগ ও তদজনিত উদ্বাস্তু সমস্যার দরুণ সবচাইতে বেশি সমস্যায় পড়েছিল নারীরা। ১৯৫০ সালে নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানে

সম্পাদিত হলেও নারীদের স্বার্থ রক্ষায় তা ব্যর্থ হয়েছিল। অপহরণ ও ধর্ষণে নারীদের জীবনে বিভীষিকা নেমে এসেছিল। আবার পশ্চিমবঙ্গে এসেও উদ্বাস্তু জীবনের অভাব অভিযোগকে সঙ্গী করে বাধ্য হয়ে জীবিকা উপার্জনের পথে নামতে হয়। কুন্তলা লাহিড়ী দত্ত তার 'The Anglo-Indians of Calcutta' গ্রন্থে দেখিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তু পরিবারের মেয়েরা জীবিকা অর্জনের তাগিদে কর্মজগতে প্রবেশ করেছিল।[২৮] মনিকুন্তলা সেন লিখেছেন 'পূর্ববঙ্গের' এইসব মেয়েরা শিক্ষিকা, নার্স, কেরানী কোন কাজে নেই? বরং পশ্চিমবঙ্গ মেয়েদের তুলনায় এরাই সম্ভবত রুজির ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই একটা ব্যাপারে একদিনের সর্বস্বহারা মেয়েরা পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের যে কি উপকার করেছে তা হয়তো কেউই টের পায়নি। ঐ মেয়েদের নির্ভীক চলাফেরা এবং রুজির জন্য ঘা মেরে মেরে সমস্ত বন্ধ দুয়ারগুলি খুলে দেওয়া, সম্ভবত এদের প্রয়োজনের চাপ ও সংখ্যার চাপে ছাড়া সহজ হতো না।[২৯]

দেশভাগ নিয়ে একাধিক গবেষনা, কর্ম, সাহিত্য, সিনেমা তৈরী হয়েছে, যা দেশভাগের স্মৃতিকে উস্কে দেয়। পাঞ্জাব ভাগ নিয়ে ভীষ্ম সাহানি, সাদাত হাসান মান্টো, খুশওয়ান্ত সিং প্রমুখ সাহিত্যিকদের কলমে একাধিক রচনা পাওয়া যায়। তেমনি দেশ তথা বাংলাভাগের কথা বাংলা সাহিত্য রচনায় উঠে এসেছে, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীল কণ্ঠ পাখির খোঁজে, হাসান আজিজু হকের আগুন পাখি, কপিল কৃষ্ণ ঠাকুরের উজানতলীর উপকথা, প্রফুল্ল রায় এর গ্রন্থ শতধারায় বয়ে যায়, কেয়াপাতার নৌকা প্রভৃতি গ্রন্থে। দেশভাগের কথা উঠে এসেছে গবেষনা মূলক গ্রন্থ চন্দনকুমার কুন্ডু লিখিত ছেচল্লিশের 'দাঙ্গা ও দেশভাগ বাংলা উপন্যাসের দর্পনে", হেনা সিনহা লিখিত বাংলা উপন্যাসে 'দেশভাগ ও ভগ্ননীড়ের বেদনা" গ্রন্থে। এছাড়া ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র সুবর্নরেখা, মেঘে ঢাকা তারা, উৎপল দত্তের নাটক তিতাস একটি নদীর নাম প্রমুখতে উদ্বাস্তু জীবনের যন্ত্রনাকে তুলে ধরা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান হয়েছে একথা কেউ বলতে পারবে না। আজও উদ্বাস্তুরা তাদের দাবি দাওয়া ও না পাওয়ার ব্যাথা ও দেশভাগের বেদনাময় স্মৃতি বহন করে চলেছে। উদ্বাস্তুরা বেঁচে আছে বস্তুত এক দ্বিতীয় জীবনের সত্তা নিয়ে, অতীতের স্মৃতির সাথে প্রতি মুহূর্তে সংগ্রাম করে। পশ্চিমবঙ্গেও তাদের লড়াই থেমে থাকেনি। মাথা গোঁজার ঠাঁই, অন্নের সংস্থান করতে ঘিয়ে তাদের অনেক মূল্য চোকাতে হয়েছে। তাছাড়া একটি মনস্তাত্ত্বিক দিকও রয়েছে যেখানে একদিকে রয়েছে দেশ এর মাটির হারাবার দুঃখ ও অন্যদিকে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দাদের উন্নাসিক মানসিকতার প্রকাশ। তবে এইসব নিয়েই উদ্বাস্তুরা নিজেদের জীবনযুদ্ধে এগিয়ে চলেছে। বামপন্থী রাজনীতি সংগ্রামী মানসিকতার প্রসারে উদ্বাস্তুদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. আহমেদ, আবুল মনসুর; *আমার দেখা রাজনীতির একশো বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৫ পৃ.১৯৯

২. রায়, অন্নদাশঙ্কর; *স্বাধীনতার পূর্বাভাষ*, শৈব্যা পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯৮০ পৃ: ১৪৩

৩. ঘোষ, শংকর; *হস্তান্তর*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯ পৃ.৬৪

৪. তদেব,পৃ. ৬৪

৫. সিংহ, তুষার ; *মরনজয়ী সংগ্রামে বাস্তুহারা*, দাশগুপ্ত, কলকাতা, ১৯৯৯ পৃ.৫

৬. দে, বাপী ; *কলকাতার উদ্বাস্তু সমস্যা*, ইতিহাস অনুসন্ধান ৮

৭. সিংহ, তুষার ; পূর্বোক্ত, পৃ.৪

৮. হিরন্ময়, বন্দ্যোপাধ্যায় ; *উদ্বাস্তু*, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৭০

৯. তদেব, পৃ. ৯২

১০. তদেব, পৃ. ৯৪

১১. জয়শ্রী, শ্রাবণ, ১৩৭৭, পৃ. ১৭১

১২. মিত্র, অশোক ; *কবিতা থেকে মিছিলে*, অয়ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮০ পৃ. ৭৪

১৩. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৪.১১.১৯৪৮

১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ; *দেশভাগ দেশত্যাগ*, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৬৪

১৫. সেন, ঘোষ, শ্রচিব্রত ও অমিয় ; *আধুনিক ভারত* (১৮৮৫-১৯৬৪), ঘোষ, মিত্রম, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ৪৭৯

১৬. তদেব,পৃ. ৪৭৯

১৭. পাল, বাবুল কুমার ; *বরিশাল থেকে দন্ডকারন্য*, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, ২০১৩

১৮. Franda, Marcus; *Political development and Political decay in Bengal*, Farma K. L. Mukhhopadhyay, Calcutta, 1981

১৯. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৪৮

২০. Basu, Jayanti; *Reconstructing in Bengal Partition*, Samya. Calcutta

২১. সিংহ, তুষার, পূর্বোক্ত, পৃ-৩৪

২২. হোম, পাল, *আই. বি ফাইল* নং ৩৯৭/৩৯, রাজ্য লেখ্যাগার, কলকাতা

২৩. *ইতিহাস অনুসন্ধান*, ৪

২৪. সেন, মনিকুন্তলা; *সেদিনের কথা*, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ.১৮২

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়, পূর্বোক্ত, পৃ.৯০-৯১

২৬. তদেব, পৃ. ১৫৫

২৭. ২-৩/১/১৯৫৪, স্বাধীনতা

২৮. Lahiri Dutta, Kuntala; *The Anglor-Indians of Calcuta*, the Living City Vol. 2, Minerva Associates, 1990

২৯. সেন, মনিকুন্তলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩